চীন : পরাশক্তির বিবর্তন-৪

দুর্ভিক্ষ, মস্কো-পিকিং বিরোধ ও সাংস্কৃতিক বিপ্লব

আনু মুহাম্মদ

চীন কি সমাজতান্ত্রিক না পুঁজিবাদী না নতুন এক ব্যবস্থার দেশ? এই প্রশ্ন নিয়ে বিশ্বব্যাপী বিতর্ক থাকলেও এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, বর্তমান বিশ্বে চীন এক পরাশক্তি। প্রচলিত জিডিপি বিচারে যুক্তরাষ্ট্রের পরই দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি। আর ক্রয়ক্ষমতার সমতার নিরিখে (পিপিপি) বিচার করে চীন এখন বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতি। পুঁজিবাদী বিশ্ব অর্থনীতিতে চীনের প্রভাব ক্রমেই বিস্তৃত হচ্ছে। এর পাশাপাশি চীন সাম্রাজ্যবাদী বিশেষণেও অভিহিত হচ্ছে। এই চীন তার বিশাল জনসংখ্যা নিয়ে কীভাবে বিপ্লব করেছিল? বিপ্লবের পর চীনের অগ্রযাত্রা আমরা কীভাবে ব্যাখ্যা করবো? সম্প্রতি চীনের দ্রুত বিস্ময়কর অর্থনৈতিক গতির রহস্য কী? দেশের ভেতর বৈষম্য, দুর্নীতি বৃদ্ধি, বিশাল ধনিক গোষ্ঠীর প্রবল আধিপত্য ইত্যাদির সাথে কমিউনিস্ট পার্টির একক শাসন কীভাবে সঙ্গতিপূর্ণ? কথিত বাজার সমাজতন্ত্রেরই বা স্বরূপ কী? বিশ্বের বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য এর তাৎপর্য কী? এসব প্রশ্ন অনুসন্ধান করতেই এই লেখার পরিকল্পনা। কয়েক পর্বে প্রকাশিতব্য এই লেখার চতুর্থ পর্বে চীনে দুর্ভিক্ষ, আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে মস্কো-পিকিং বিরোধ এবং সাংস্কৃতিক বিপ্লবের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করা হয়েছে।

দুর্ভিক্ষ: প্রচারণা ও পর্যালোচনা

গত পর্বেই বলেছি চীনে 'উল্লম্ফনের' সময় জটিলতা হয়েছিল, ব্যবস্থাপনার সমস্যা ছিল, কিছু এলাকায় খাদ্য ঘাটতির কারণে দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতিও সৃষ্টি হয়েছিল। পাশাপাশি প্রাকৃতিক দুর্যোগও ছিল। মাও সে তুং নিজেও এই সময়ে বিভিন্নরকম ত্রুটিবিচ্যুতির কথা স্বীকার করেছেন। কিন্তু দুর্ভিক্ষ নিয়ে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে মনগড়া পরিসংখ্যান দিয়ে যেভাবে প্রচার চালানো হয় তাতে প্রকৃত চিত্র পাওয়া যায় না। এসব প্রচারণা অনেকসময় এই পর্যন্ত যায় যে, মাও সেতুং নিজেই এসব হত্যাকাণ্ডের পেছনে ছিলেন! তিনি চেয়েছিলেন এবাবে মানুষ মরুক, তাহলে উন্নয়নের সুবিধা হবে!!

মাও সেতুং-এর বিরুদ্ধে বিশ্বজুড়ে সমালোচনা ও কুৎসার বড় ক্ষেত্র দুটি। এর মধ্যে একটি হলো Great Leap Forward বা উল্লম্ফন এবং আরেকটি হলো সাংস্কৃতিক বিপ্লব। বস্তুত মাও-উত্তর চীনে, ১৯৭৮ সালে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির তৃতীয় প্লেনারী মিটিং এর পর থেকে মাও বিরোধী রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক তৎপরতা ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে। এর সাথে যোগ হয় আন্তর্জাতিক প্রচারণা।

উল্লম্ফন বা ১৯৫৮-৬২ সময়কালে গৃহিত কর্মসূচির কারণে দুর্ভিক্ষ এবং তাতে মানুষের মৃত্যুর সংখ্যা নিয়ে বহু লেখা, গবেষণা এবং প্রচারণা হয়েছে। বিশেষ করে ৮০ দশক থেকে এই বিষয়ে প্রচারণা আরও বৃদ্ধি পায়। চীনে মাও পরবর্তী সরকারগুলোও তাতে যোগ দেয়। এসব প্রচারণায় সরকারের প্রকাশনা ছাপিয়ে দুর্ভিক্ষে মৃতের সংখ্যা ক্রমেই বাড়তে থাকে। মৃতের সংখ্যা বিষয়ে বিভিন্ন গালগল্প ছাড়াও গবেষণার সূত্র উল্লেখ করা হয়। এগুলো হলো: ১৯৮২ ও ১৯৮৭ সালে উত্তর আমেরিকার দুজন জনসংখ্যাতত্ত্ববিদের দুটি গবেষণা। পরে অমর্ত্য সেনের মাধ্যমে এটি অনেক বেশি প্রচার পায়। সেন এসব পরিসংখ্যানের ওপর ভিত্তি করে তত্ত্বও দাঁড় করান।

এসব গবেষণার পদ্ধতি ছিল বিভিন্ন বছরে মৃত্যুহার তুলনা করা। এই তুলনামূলক গবেষণা শুরু হয় ১৯৮২ থেকে, তারপর তা পেছনের বছরগুলোতে যায়। চীনে ১৯৮২ সালের আদমশুমারী কালে ১০ লাখ মানুষের মধ্যে একটি জরীপ চালানো হয়। জরীপে তাদের ১৯৫০ দশক ও তার পরবর্তী সময়ে জন্ম ও মৃত্যু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়। এই জরীপ ফল থেকেই জানানো হয় যে, ১৯৫৩ ও ১৯৬৪ এই দুই শুমারী বর্ষের গণনার চাইতে আরও বেশি জন্ম হয়েছিল। ১৯৫৩ সালের জরীপে আরও বড় নমুনা সংখ্যা থেকে জন্মহার পাওয়া গিয়েছিল হাজারে ৩৭ জন, তা উপেক্ষা করে ১৯৮২-র জরীপ থেকে ৫০ দশকের জন্য জন্মহার হিসাব করা হয় হাজারে ৪৩-৪৪। এর ফলে ১৯৫৩ ও ১৯৬৪-র মধ্যে অতিরিক্ত জন্ম দেখা যায় প্রায় ৫ কোটি জনের।

তবে ১৯৫৮ থেকে ১৯৬২ সালের মৃত্যুহার তুলনা করতে অস্বাভাবিকতা ঠিকই নজরে আসে। ১৯৫৮ সালে মৃত্যুহার ছিল ১২, ১৯৫৯ সালে তা বেড়ে হয় ১৪.৬, ১৯৬০ সালে তা অনেক বেড়ে হয় ২৫.৪ এবং পরের বছর তা আবার নেমে ১৪.২, এবং ১৯৬২ সালে তা আবার ১০-এ পৌঁছায়। ১৯৬০ সালে এই মৃত্যুহার অস্বাভাবিক, কোনো সন্দেহ নেই। তবে ভারতের প্রখ্যাত গবেষক উষা পাটনায়েক জানিয়েছেন, এই একই বছর ভারতে এই হার ছিলো ২৪.৮, তা নিয়ে কোনো প্রশ্ন কেউ তোলেনি। উষা পাটনায়েক ১৯৮২ থেকে পেছনে গিয়ে স্মৃতিশক্তি নির্ভর উপাত্তের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত টানার বিরোধিতা করে কাণ্ডজ্ঞানের একটি প্রশ্ন উত্থাপন করেন এইভাবে, 'যখন বৃটেনের উপনিবেশ আয়ারল্যান্ডে ১৮৪৬-৪৭ সালে দুর্ভিক্ষে ১০ লক্ষ মানুষ মারা গেলেন পুরো দুনিয়া তা জানতো, যখন ১৯৪৩-৪৪ সালে বাংলার দুর্ভিক্ষে ৩০ লক্ষ মানুষ নিহত হন তখনও এই খবর সবার জানা ছিল। কিন্তু চীনে দুর্ভিক্ষে ৩ কোটি মানুষ নিহত হবার কথা বলা হয় অথচ তা সেইসময়ে কেউ জানলো না, এমনকি চীনে তখন অবস্থানরত বিদেশি কূটনীতিক, বিভিন্ন ব্যক্তি-সাংবাদিক-সংস্থা যারা চীনের দিকে সর্বক্ষণ নজর রাখতো নানা ভুলত্রুটি ধরবার জন্য তারা কেউ জানলো না তা কি করে হয়? যারা এগুলো বলেন তারা বেশ চালাক কিন্তু তারা আসলে নিজেদের নির্বোধ আকারেই হাজির করছেন।'[১]

জোসেফ বেল এই বিষয়ে আরও অনুসন্ধান করেছেন। তিনি কয়েকটি গবেষণা-প্রচারণার উল্লেখ করে দেখিয়েছেন কীভাবে সেগুলো প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিষয় উপেক্ষা করে যুক্তি ছাড়া শুধু নিহতের সংখ্যা বাড়িয়ে দেখিয়েছে। পাশাপাশি তাদের গবেষণাতেই ধরা পড়েছে ১৯৪৯-১৯৭৫ সময়কালে কী দ্রুত হারে মৃত্যুহার কমেছে। ১৯৪৯ সালে যেখানে আয়ুসীমা ছিল ৩৫ সেখানে ১৯৭৫ সালে তা দাঁড়িয়েছে ৬৫। চীনা ইতিহাস বিশেষজ্ঞ কার্ল রিসকিন বলেছেন, 'চীনে সেসময় দুর্ভিক্ষ হয়েছিল ঠিকই কিন্তু সেটা ব্যাপক আকার নিতে পারেনি। চীনের বিপ্লবপূর্ব কালের সাথেও তার তুলনা করা যায় না।' জোসেফ বেল বহু উদ্ধৃত দ্য চায়না কোয়ার্টারলির কথা উল্লেখ করেছেন, যার প্রকাশনায় সিআইএ অর্থ যোগান দিতো বলে সম্পাদকও এক পর্যায়ে স্বীকার করেছেন।[২]

দংপিং হান ৫০ দশকের শেষ দিক থেকে গ্রামাঞ্চলে তাঁর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে লিখেছেন। তিনি লিখেছেন, 'ভূমি সংস্কারের মধ্য দিয়ে গ্রামাঞ্চলের শতকরা ৬০ ভাগ গরীব ভূমিহীন মানুষ জমি, কৃষি যন্ত্রপাতি এবং অধিকার পেয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় উল্লম্ফনকালে অলস ও ঢিলা মৌসুমকে উদ্যোগ, ব্যবস্থাপনা ও প্রযুক্তি দিয়ে ব্যস্ত ও কর্মচঞ্চল মৌসুমে পরিণত করা হয়েছে। ১৯৫৮, ৫৯ ও ৬০ সালে গ্রামের মানুষ বহুরকম কাজে যুক্ত হয়েছেন, জলাধার, পানির কূপ, নদী ও খালখনন, সেচনালা তৈরি ইত্যাদি। এগুলো জাতীয় পর্যায় থেকে একেবারে গ্রাম পর্যায়ের বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়ন হচ্ছিল।'[৩]

অধিক আলোচিত প্রকল্পগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: বেইজিংএ সিসাংলিং জলাধার, উত্তর চীনের প্রধান পাঁচটি নদী সংযুক্ত করতে হাই নদী প্রকল্প, হুনানে ইয়েলো রিভার স্যানমেনজিয়া প্রজেক্ট, লিন কাউন্টিতে রেড ফ্ল্যাগ ইরিগেশন চ্যানেল সহ অনেক প্রকল্প। বহু অঞ্চলে ছোটবড় জলাধার নির্মাণ এবং সেচব্যবস্থার তৎপরতা ছিল উল্লেখযোগ্য। তবে এটা ঠিক যে, এতোসব নির্মাণযজ্ঞে ব্যবস্থাপনাগত সমস্যা ছিল, সমন্বয়ের সমস্যা ছিল।

পিকিং (বেইজিং)-মস্কো বিরোধ শুরু

যখন চীন একদিকে দ্রুতগতিতে উন্নয়নের পথ খুঁজছে, অন্যদিকে ভেতর বাইরে মতাদর্শিক লড়াই চালাচ্ছে, সর্বোপরি যখন প্রতিমুহূর্তে সাম্রাজ্যবাদী অন্তর্ঘাত ও আক্রমণের আশংকা বাড়ছে তখনই চীনের সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের সম্পর্কে ফাটল ধরে। প্রথমদিকে মতাদর্শিক বিতর্কের মধ্যে বিরোধ সীমাবদ্ধ থাকলেও ৬০ দশকের মাঝামাঝি দুদেশের সম্পর্ক বৈরী পর্যায়ে চলে যায়। দেশে দেশে তার প্রভাব বিশ্বজুড়ে বিপ্লবী আন্দোলনকেই বিপর্যয়ের মধ্যে নিক্ষেপ করে।

১৯৫৮ থেকে ১৯৬২ সালের মৃত্যুহার তুলনা করতে অস্বাভাবিকতা ঠিকই নজরে আসে। ১৯৫৮ সালে মৃত্যুহার ছিল ১২, ১৯৫৯ সালে তা বেড়ে হয় ১৪.৬, ১৯৬০ সালে তা অনেক বেড়ে হয় ২৫.৪ এবং পরের বছর তা আবার নেমে ১৪.২, এবং ১৯৬২ সালে তা আবার ১০-এ পৌঁছায়।

বিরোধের শুরু ৫০ দশকের শেষ থেকে। সোভিয়েত পাটির নেতৃত্বে মতাদর্শিক পরিবর্তন থেকেই এর সূত্রপাত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিটলারকে পরাজিত করে ধ্বংসস্তুপ থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নকে পুনর্গঠনের শেষ পর্যায়ে ১৯৫৩ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় নেতা জোসেফ স্ট্যালিন মৃত্যুবরণ করেন। ৫ মার্চ তাঁর মৃত্যুর পরপরই পার্টিতে ক্ষমতা নিয়ে দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে যায়। এই দ্বন্দ্বের এক পর্যায়ে সামরিক আমলাতন্ত্রের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় বিজয়ী হন এক পর্যায়ে স্ট্যালিনের সবচাইতে বড় তোয়াজকারী হিসেবে পরিচিত ক্রুশ্চভ। এই সময়ের ঘটনাবলীর একটি চিত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী)র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতাসদস্য, মার্কসের গ্রুনডিসি অনুবাদক ও গবেষক মার্টিন নিকোলাস- এর গ্রন্থ থেকে পাওয়া যায়।

মার্টিন নিকোলাস লিখেছেন, '৬ মার্চ সকাল হবার আগেই এল. বেরিয়ার নেতৃত্বাধীন প্যারামিলিটারী স্টেট সিকিউরিটি পুলিশ মস্কোর আর্মি ইউনিটকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। বেরিয়ার অনুসারীরা মস্কো ও ক্রেমলিনের ওপর সর্বাত্মক নিযন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। একইরাতে স্ট্যালিনের ব্যক্তিগত সচিব জেনারেল পক্রেবিশেভ রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে যান। তিনিই পার্টির পরবর্তী নেতৃত্ব বিষয়ে স্ট্যালিনের মতামত সম্পর্কে অবগত ছিলেন। ... দিন শেষ হবার আগেই পার্টি সেক্রেটারিয়েটের ১০জন সদস্যের ৫জন এবং কেন্দ্রীয় কমিটি নির্বাচিত প্রেসিডিয়ামের ৩৬ জন সদস্য এবং প্রার্থীদের ২২জনকে পদচ্যুত করা হয়। ৫২টি সরকারি মন্ত্রণালয়ের মধ্যে ২৭টি বাতিল করা হয়। প্রথম উপ-প্রধানমন্ত্রী হিসেবে অধিষ্ঠিত হন বেরিয়া নিজে, সর্বোচ্চ পদে অর্থাৎ প্রথম সচিব হিসেবে নিয়োজিত হন জি এম মেলানকভ। এরপরই ছিলেন ক্রুশ্চভ। মার্শাল জি ঝুকভকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেয়া হয়। ... ঘটনাবলীর ধাপগুলো হচ্ছে বেরিয়া পুচ (১৯৫৩), ক্রুশ্চভ ও মেলানকভ (১৯৫৩-৫৫), ২০তম কংগ্রেস, ১৯৫৬, এবং ক্রুশ্চভ-ঝুকভ নেতৃত্বাধীন ক্যু, ১৯৫৭।[৪] অর্থাৎ ক্ষমতার পরিবর্তনের পেছনে খুব গোছানো, সহিংস, দীর্ঘমেয়াদী কার্যক্রম ছিল।

১৯৫৬ সালে অনুষ্ঠিত ২০তম কংগ্রেস ছিল সোভিয়েত পার্টির মতাদর্শিক অবস্থান পরিবর্তনের চেষ্টার আনুষ্ঠানিক পর্ব। এর পূর্ব পর্যন্ত ক্রুশ্চেভ নিজেও স্ট্যালিন ও তাঁর অবস্থানকে সমর্থন করেছেন। নিজের অবস্থান কিছুটা সংহত করবার পর ২০তম কংগ্রেসে শুরু হয় স্ট্যালিন বিরোধী কুৎসা, অপপ্রচার এবং সেইসঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের রাজনৈতিক মতাদর্শিক পরিবর্তন। স্ট্যালিন বিরোধী কুৎসায় পার্টির মধ্যে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া হয় এবং ক্রুশ্চভ বাধ্য হয়ে এসব বক্তব্য থেকে সরে আসেন। ১৯৫৭ সালে পার্টি তাঁর নেতৃত্বের বিরুদ্ধে ভোট দেয়। কিন্তু মার্শাল ঝুকভের নেতৃত্বাধীন সেনাবাহিনী এবং বিমানবাহিনীর সমর্থনে ক্রুশ্চভ ক্ষমতায় টিকে যান। ক্রুশ্চভ বিরোধীদেরই বরং আক্রমণের সম্মুখিন হতে হয়।

১৯৫৭ সালে মস্কোতে সারাবিশ্বের ৮১টি পার্টির সম্মেলনে যে ঘোষণা গৃহীত হয় তাতে চীনের সম্মতি ছিল। ১৯৬০ সালে প্রচারিত এক যুক্ত বিবৃতিও তৈরি হয় পিকিং ও মস্কোসহ সকলের সম্মতিক্রমেই। কিন্তু এরপর থেকে, চীনের বক্তব্য অনুসারে, সোভিয়েত পার্টি এই ঘোষণা ও বিবৃতিকে অমান্য করে সংশোধনবাদী পথে যাত্রা শুরু করে। চীনা পার্টির দৃষ্টিতে সোভিয়েত পার্টি দেশের ভেতর নব্য বুর্জোয়ার পথ তৈরি করে এবং আন্তর্জাতিকভাবে সাম্রাজ্যবাদের সাথে 'শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান', 'শান্তিপূর্ণ প্রতিযোগিতা', এবং বুর্জোয়াদের সাথে নিয়ে 'শান্তিপূর্ণ পথে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ' নীতিমালার মধ্য দিয়ে বিপ্লববিরোধী অবস্থানে অধপতিত হয়। মতাদর্শিক অবস্থান নিয়ে বিতর্ক প্রথমে দুই পার্টির মধ্যে চিঠি ও প্রতিনিধি বিনিময়ে সীমাবদ্ধ থাকলেও ক্রমশ দূরত্ব বাড়তে থাকায় তা ছড়িয়ে পড়তে থাকে। বিপ্লবের পর থেকেই চীনের উন্নয়ন অভিযাত্রায় সোভিয়েত সমর্থন ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ। প্রযুক্তিগত সমর্থন এবং বিভিন্ন খাতে বিশেষজ্ঞদের আন্তরিক ও মূল্যবান অবস্থান চীনের অগ্রগতিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করছিল তখন। কিন্তু বিতর্কের এক পর্যায়ে সোভিয়েত সরকার এইসব সমর্থন প্রত্যাহার করায় বিরোধ প্রকাশ্য হয়ে পড়ে।

১৯৬৩ সালের ৬ সেপ্টেম্বর চীনের 'পিপলস ডেইলি' ও 'রেড ফ্ল্যাশ' পত্রিকায় পার্টির অবস্থানের ব্যাখ্যা প্রকাশিত হয়। এতে বলা হয়, 'আমরা নিজেদেরকে প্রশ্ন করেছি: আমাদের কি সোভিয়েত ইউনিয়ন কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিএসইউ) নেতৃত্বকে অনুসরণ করা এবং তাদের কাজের সঙ্গে নিজেদের ইচ্ছাকে সঙ্গতিপূর্ণ করে তোলা উচিত? সেক্ষেত্রে সিপিএসইউ নেতৃত্ব অবশ্যই আনন্দিত হতেন, কিন্তু আমরাই সংশোধনবাদী হয়ে পড়তাম। আমরা নিজেদেরকে এ প্রশ্নও করেছি: আমাদের পক্ষে কি সিপিএসইউ নেতৃত্বের ভুলগুলি সম্পর্কে

নীরব থাকাই উচিত কাজ হবে? আমরা বিশ্বাস করেছি যে, সিপিএসইউ নেতৃত্বের ভুলগুলি আকস্মিক, ব্যক্তিগত বা সামান্য ভুলমাত্র নয়। বরং সেগুলি সবই নীতিগত ভুল, যা সমগ্র সমাজতান্ত্রিক শিবির ও আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনকেই বিপদের পথে ঠেলে দিচ্ছে। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম অংশ হিসেবে কীভাবে আমরা এই ভুলগুলি সম্পর্কে নির্লিপ্ত ও নীরব থাকি? তা করলে আমরা কি মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও সর্বহারা আন্তর্জাতিকতা রক্ষার কর্তব্য থেকেই বিচ্যুত হতাম না?'[৫]

ভারতের সাথে যুদ্ধ এবং সোভিয়েত পার্টির সাথে বিরোধের বিস্তার

'বিরাট উল্লম্ফনের' ওঠানামা, সাফল্য ব্যর্থতা নিয়ে নিজেদের মধ্যে বিতর্ককালেই সোভিয়েত পার্টির সাথে বিরোধ ও বিতর্ক শুরু হয়। ঠিক একইসময়ে ভারতের সাথে সীমান্ত বিরোধ থেকে যুদ্ধ শুরু হয় ১৯৬২ সালে। ১৯৫০ সালে চীনের গণমুক্তি বাহিনী তিব্বত দখলে নেয়। ১৯৫৬-৫৭ সালে ঐ অঞ্চলে একটি সড়ক নির্মাণ করে আকসাই চিন নামক স্থানে সীমান্ত চৌকি স্থাপন করে। এই সড়ক ও চৌকি নিয়েই বিরোধের সূত্রপাত।

এর মধ্যে ১৯৫৪ সালে চীন ও ভারত শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের জন্য পাঁচটি নীতিতে একমত হয়, যা পরে 'পঞ্চশীলা নীতি' নামে পরিচিতি পায়। এই পাঁচটি নীতি হলো: '(১) পারস্পরিক ভৌগোলিক অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব বিষয়ে পরস্পরের শ্রদ্ধা; (২) পারস্পরিক অনাক্রমণ নীতি; (৩) পরস্পরের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা; (৪) পারস্পরিক স্বার্থে সমতা ও সহযোগিতা; এবং (৫) শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান।' এই নীতিমালার সঙ্গে পরে আরও বহু দেশ ক্রমান্বয়ে যুক্ত হয়। এই নীতি সম্প্রসারিত করে ১৯৫৫ সালে ইন্দোনেশিয়ার বানদুং এ এশিয়া আফ্রিকা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা হতে থাকে সদ্য স্বাধীন দেশগুলোর মধ্যে, নয়া ঔপনিবেশিক থাবা থেকে কীভাবে বাঁচা যায় তার পথ অনুসন্ধান চলতে থাকে। এই প্রক্রিয়ায় উপরোক্ত নীতিমালার ওপর ভিত্তি করেই কয়েকবছরের মধ্যে ১৯৬১ সালে জন্ম নেয় জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন। এর নেতৃত্বে ছিলেন চীনের চৌ এন লাই, ভারতের জওহরলাল নেহেরু, ইন্দোনেশিয়ার সুকার্ণো এবং যুগোশ্লাভিয়ার টিটো। সুকার্ণো অবশ্য এধরনের নীতিমালার প্রস্তাব করেছিলেন আরও আগে, ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রাম কালেই।

'বিরাট উল্লম্ফনের' ওঠানামা, সাফল্য ব্যর্থতা নিয়ে নিজেদের মধ্যে বিতর্ককালেই সোভিয়েত পার্টির সাথে বিরোধ ও বিতর্ক শুরু হয়। ঠিক একইসময়ে ভারতের সাথে সীমান্ত বিরোধ থেকে যুদ্ধ শুরু হয় ১৯৬২ সালে।

ভারত ও চীনের বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য আলোচনা ভালোই অগ্রসর হচ্ছিল। তখন 'হিন্দী-চীনি ভাই ভাই' এই শ্লোগানটিও বেশ জনপ্রিয় ছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভারত ও চীনের শান্তিপূর্ণ আলোচনা ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পথে বড় প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়ালো তিব্বত প্রশ্ন। ১৯৫৯ সালে তিব্বতের ধর্মীয় নেতা ১৪তম দালাইলামা চীন বিরোধী বিদ্রোহে পরাজিত হয়ে লাসা থেকে পালিয়ে ভারতে এলেন। নেহেরু সরকার তাঁকে আশ্রয় দেবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করায় দুদেশের মধ্যে সম্পর্কের দ্রুত অবনতি ঘটলো এবং একপর্যায়ে যুদ্ধের মুখোমুখি হলো বিশ্বের দুটি বৃহৎ দেশ। অর্থাৎ হিমালয় সীমান্তে ৩২২৫ কিলোমিটার এলাকা নিয়ে বিরোধ যুদ্ধের প্রধান কারণ হিসেবে সামনে থাকলেও তিব্বত প্রশ্নটি এর পেছনে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক হিসেবে কাজ করেছে। চীন ১৯৬২ সালের ২০ অক্টোবর লাদাখ এবং ম্যাকমোহন লাইন বরাবর অগ্রসর হলে যুদ্ধ শুরু হয়। চীন বেশ কিছু অঞ্চল নিজেদের দখলে নিয়ে নেয়। ঠিক একমাস পরে নিজেরাই যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করে ঐসব অঞ্চল থেকে সরে এলে যুদ্ধ শেষ হয়। এই সময়কালে যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন উভয়েরই অবস্থান ছিল কমবেশি প্রত্যক্ষ প্রচ্ছন্নভাবে ভারতেরই পক্ষে। এরপর থেকে চীনের সাথে সোভিয়েত ইউনিয়নের দূরত্ব বাড়তে থাকে, ভারতের সাথে সোভিয়েত ইউনিয়নের ঘনিষ্ঠতা বাড়তে থাকে।

১৯৬৩ সালের ৩০ মার্চ সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি নিজেদের অবস্থান জানিয়ে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে একটি পত্র দেয়, চীনা পার্টিও নিজেদের অবস্থান পরিষ্কার করে দীর্ঘ জবাব দেয়। ১৯৫৭ ও ১৯৬০ সালে মস্কোতে অনুষ্ঠিত বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের কমিউনিস্ট পার্টির আন্তর্জাতিক সম্মেলনে গৃহিত ঘোষণা ও বিবৃতিকেই চীনা পার্টি নিজেদের অবস্থানের ভিত্তি হিসেবে বর্ণনা করে। বিতর্কের প্রথম দিকে ভাষা ছিল বন্ধুত্বপূর্ণ। এই চিঠির এক পর্যায়ে সোভিয়েত পার্টিকে উদ্দেশ্য করেই বলা হয়: 'বর্তমান বিশ্বের মূল দ্বন্দ্বগুলি সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণাগুলির অবসান হওয়া উচিত: (ক) যে ধারণা সমাজতান্ত্রিক শিবির ও সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের মধ্যেকার দ্বন্দ্বের শ্রেণীগত মর্মবস্তু অস্বীকার করে এবং এই দ্বন্দ্ব যে আসলে সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্বাধীন রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে একচেটিয়া পুঁজিপতিদের একনায়কত্বাধীন রাষ্ট্রগুলির বিরোধ, তা বুঝতে ব্যর্থ হয়; (খ) যে ধারণা একমাত্র সমাজতান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের মধ্যেকার দ্বন্দ্বকেই স্বীকৃতি দেয় এবং যে ধারণা পুঁজিবাদী দুনিয়ার সর্বহারা শ্রেণী ও পুঁজিপতি শ্রেণীর মধ্যকার দ্বন্দ্ব, নিপীড়িত জাতিসমূহ ও সাম্রাজ্যবাদের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব, সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব, বিভিন্ন একচেটিয়া পুঁজিপতি গোষ্ঠীর মধ্যেকার দ্বন্দ্ব, এবং এইসব দ্বন্দ্বের ফলে যেসব সংগ্রাম দেখা দেয় সেগুলিকে অবহেলা করে কিংবা যথোচিত গুরুত্ব দিতে অস্বীকার করে; (গ) যে ধারণা অনুসারে, দেশে দেশে সর্বহারা শ্রেণীর বিপ্লব ছাড়াই, পুঁজিবাদী দুনিয়ার, সর্বহারা শ্রেণী ও পুঁজিপতি শ্রেণীর মধ্যেকার দ্বন্দ্বগুলির সমাধান হতে পারে,এবং নিপীড়িত জাতিগুলির বিপ্লব ছাড়াই নিপীড়িত জাতি ও সাম্রাজ্যবাদের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব সমাধান হতে পারে; (ঘ) যে ধারণা একথা অস্বীকার করে যে, বর্তমান পুঁজিবাদী দুনিয়ার অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বগুলির ফলে নিশ্চিতভাবেই এমন এক অবস্থার সৃষ্টি হয়, যখন সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি নিজেরাই তীব্র দ্বন্দ্বে জড়িত হয়ে পড়ে, এবং যে ধারণা দাবি করে যে, সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির মধ্যেকার দ্বন্দ্বগুলির মীমাংসা, এমনকি অবসানও, 'বৃহৎ একচেটিয়া পুঁজিপতি গোষ্ঠীগুলির আন্তর্জাতিক চুক্তি দ্বারা'ই সম্ভব, এবং (ঙ) যে ধারণা অনুসারে, সমাজতান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থা দুটির মধ্যেকার দ্বন্দ্বগুলি 'অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা'র মাধ্যমে নিজে থেকেই লোপ পাবে, এবং এই ব্যবস্থা দুটির মধ্যেকার দ্বন্দ্বগুলির অবসানের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের অন্যান্য মৌলিক দ্বন্দ্বগুলিও নিজে থেকে লোপ পাবে, আর তখন দেখা দেবে এক 'যুদ্ধহীন দুনিয়া', সে দুনিয়ায় থাকবে শুধু 'সর্বাঙ্গীন সহযোগিতা'।'[৬]

মস্কোপন্থী ও পিকিংপন্থী রাজনীতিতে বিভক্ত বিশ্ব

সোভিয়েত পার্টির সাথে বিতর্কের এক পর্যায়ে কী কী ধরন থাকলে কোনো 'বিপ্লবী পার্টি' আর বিপ্লবী পার্টি থাকতে পারে না তার বিষয়ে চীনা পার্টির প্রকাশনায় বিশদ বলা হয়েছিল। সেগুলো যদি তালিকা

হিসাবে উপস্থিত করি তাহলে তা হবে এরকম, (১) সর্বহারা বিপ্লবী পার্টি না হয়ে কোনো পার্টি যদি বুর্জোয়া সংস্কারবাদী পার্টি হয়, (২) মার্কসবাদী লেনিনবাদী পার্টি না হয়ে কোনো পার্টি যদি সংশোধনবাদী পার্টি হয়, (৩) সর্বহারা শ্রেণীর অগ্রগামী বাহিনী না হয়ে কোনো পার্টি যদি বুর্জোয়া শ্রেণীর লেজুড়ে পরিণত হয়, (৪) সর্বহারা শ্রেণী ও শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থের পরিবর্তে কোনো পার্টি যদি শ্রমিক অভিজাতদের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে, (৫) আন্তর্জাতিকতাবাদী না হয়ে যদি কোনো পার্টি জাতীয়তাবাদী হয়, (৬) কোনো পার্টি যদি নিজের চিন্তা নিজে করতে না পারে, গভীর অনুসন্ধান ও গবেষণা দ্বারা নিজের দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর প্রবণতা সম্পর্কে সঠিক ধারণা অর্জনে সক্ষম না হয়, (৭) মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিশ্বজনীন সত্যকে কীভাবে প্রয়োগ করতে ও নিজদেশের বাস্তব অনুশীলনের সঙ্গে সমন্বিত করতে হয় তা না জানে এবং তার পরিবর্তে কেবল অন্যের কথা কপচায়, (৮) কোনোরকম বিচার বিশ্লেষণ ছাড়াই বিদেশি অভিজ্ঞতার অনুসরণ করে, (৯) বাইরের কিছু ব্যক্তির ছড়ি ঘোরাবার সঙ্গে সঙ্গে এদিক ওদিক দৌড়াদৌড়ি করতে থাকে এবং মার্কসবাদ লেনিনবাদ ছাড়া সংশোধনবাদ, গোঁড়ামিবাদ ইত্যাদি সবকিছুরই জগাখিচুড়িতে পর্যবসিত হয়- তবে এরকম পার্টি বিপ্লবী সংগ্রামে সর্বহারা শ্রেণী ও জনগণকে নেতৃত্ব দানে পুরোপুরি অক্ষম হবে, বিপ্লবের বিজয় অর্জনে অক্ষম হবে এবং সর্বহারা শ্রেণীর মহান ঐতিহাসিক লক্ষ্যসাধনে সম্পূর্ণ অক্ষম হবে।[৭]

তালিকার ১ থেকে ৫ পর্যন্ত বিষয়গুলো বলা হয়েছে সোভিয়েত পার্টির উদ্দেশ্যে। আর ৬ থেকে ৯ পর্যন্ত বিষয়গুলো বলা হয়েছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সেইসব পার্টির উদ্দেশ্যে যারা মস্কোকে অন্ধভাবে অনুসরণ করছিল। উল্লেখ্য যে, চীনা পার্টি সোভিয়েত পার্টি সম্পর্কে যেসব অভিযোগ করেছিল কয়েকবছরের মধ্যে তার অনেক অভিযোগ চীনা পার্টির বিরুদ্ধে উত্থাপন করে আলবেনিয়া পার্টি। এর মধ্যে বিপ্লবী আন্দোলনের দুটো কেন্দ্র সৃষ্টি হয় মস্কো ও পিকিং। পুরো বিশ্বের বিপ্লবী আন্দোলন বিভক্ত হয়ে যায় দুই পরস্পর বিদ্বেষী শিবিরে, পিকিংপন্থী এবং মস্কোপন্থী। পরের বছরগুলোতে আমরা লক্ষ্য করি তালিকার ১ থেকে ৫ পর্যন্ত অভিযোগগুলোর অনেকটাই চীনা পার্টির জন্য প্রযোজ্য হচ্ছে। আর ৬ থেকে ৯ পর্যন্ত উত্থাপিত ধরনগুলো মস্কোপন্থী পার্টিগুলোর সাথে সাথে পিকিংপন্থী পার্টিগুলোর মধ্যেও একইভাবে দেখা যাচ্ছে।

চীনা পার্টি সোভিয়েত পার্টি সম্পর্কে যেসব অভিযোগ করেছিল কয়েকবছরের মধ্যে তার অনেক অভিযোগ চীনা পার্টির বিরুদ্ধে উত্থাপন করে আলবেনিয়া পার্টি। এর মধ্যে বিপ্লবী আন্দোলনের দুটো কেন্দ্র সৃষ্টি হয় মস্কো ও পিকিং। পুরো বিশ্বের বিপ্লবী আন্দোলন বিভক্ত হয়ে যায় দুই পরস্পর বিদ্বেষী শিবিরে, পিকিংপন্থী এবং মস্কোপন্থী।

৬০ দশকের মাঝামাঝি মস্কো-পিকিং বিরোধের উত্তেজনা বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে। পাকিস্তানে কমিউনিস্ট পার্টি তখন ছিল গোপন, সেজন্য এসব ভাঙনের বিষয় কর্মীরা জেনেছেন অনেক পরে। শেষভাগে এসে অন্যান্য দেশের মতো পাকিস্তান/বাংলাদেশ/ভারতেও মস্কো-পিকিং বিভাজন প্রকাশ্য হয়ে পড়ে। ছাত্র, শ্রমিক, কৃষকসহ শ্রেণী ও গণসংগঠনগুলো প্রথমে বিভক্ত হয়। পরে পার্টিও মস্কো ও পিকিংপন্থী এরকম ভিন্ন ভিন্ন পরিচয়ে দাঁড়ায়। খোদ কেন্দ্রের ভূমিকার পার্থক্যের কারণে এই দুই পন্থী পার্টিগুলোর মধ্যে একটি বড় পার্থক্য তৈরি হয় পৃষ্ঠপোষকতার ক্ষেত্রে। বিশ্বজুড়ে মস্কো তার অনুসারী পার্টিগুলোর প্রতি দায়িত্ব পালনে বরাবরই সচেষ্ট ছিল। বস্তুগত সমর্থন ও তাত্ত্বিক দিশাদানে মস্কোর কোন ঘাটতি দেখা যায়নি, আন্তর্জাতিক সংহতির প্রকাশ হিসেবে বিভিন্ন সাংগঠনিক প্রক্রিয়াও সক্রিয় ছিল। কিন্তু সম্পদের অভাব কিংবা আন্তর্জাতিক প্রভাববলয় তৈরিতে অনাগ্রহ - যে কারণেই হোক পিকিং- এর পক্ষ থেকে পিকিংপন্থী পার্টিগুলোকে এরকম সমর্থন দিতে দেখা যায় নি। কেন্দ্রীয় তদারকি ও পৃষ্ঠপোষকতার কারণে মস্কোপন্থী পার্টিগুলোতে ভাঙন দেখা যায়নি, কিন্তু পিকিংপন্থী পার্টিগুলো একের পর এক ভাঙনের শিকার হয়েছে। তারা একদিকে 'মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিশ্বজনীন সত্যকে কীভাবে প্রয়োগ করতে ও নিজদেশের বাস্তব অনুশীলনের সঙ্গে সমন্বিত করতে হয় তা না জেনে পরিবর্তে' কেবল পিকিং এর কথা কপচিয়েছে, উপরন্তু 'কোনোরকম বিচার বিশ্লেষণ ছাড়াই বিদেশি অভিজ্ঞতার অনুসরণ করেছে' এবং 'বাইরের কিছু ব্যক্তির ছড়ি ঘোরাবার সঙ্গে সঙ্গে এদিক ওদিক দৌড়াদৌড়ি করেছে' অন্যদিকে এবিষয়ে কোন কেন্দ্রীয় সমর্থন বা দিকনির্দেশনাও পায়নি। কর্তা খোঁজা লোকজনের কর্তার অভাবে তাই পিকিংপন্থীরা এক থেকে দুই, দুই থেকে চার এইভাবে ভাংতে থাকে। বিপ্লবের নামে নানা লাইনের জন্ম হতে থাকে।

আন্তর্জাতিক মতাদর্শিক এই বিতর্ককালে চীনে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃবৃন্দের মধ্যেকার বিরোধ কমেনি, বরং ভেতরে ভেতরে আরও দানা বাঁধছিল। উল্লম্ফনের অভিজ্ঞতার পরে মাও সে তুং কিছুটা কোণঠাসা, তাঁর সমালোচক ও বিরোধী অংশই তখন কেন্দ্রীয় কমিটিতে শক্তিশালী। এই পরিপ্রেক্ষিতেই এলো সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ডাক। মাও সেতুং এর আহবানে সারাদেশে, বিশেষত তরুণদের মধ্যে, দেখা গেলো 'নতুন জাগরণ'।

সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সূচনা

১৯৬৬ সালেই শুরু হলো বিপ্লব উত্তর চীনের ইতিহাসের আরেকটি উল্লেখযোগ্য পর্ব, যা 'সাংস্কৃতিক বিপ্লব' নামেই বিশ্বব্যাপী পরিচিত। চীনে এর আনুষ্ঠানিক নাম দেয়া হয়েছিল 'মহান সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লব'। এই বিপ্লবের মধ্য দিয়ে মাও সেতুং পার্টিতে আবারো নিজের মতাদর্শিক অবস্থান সংহত করেন। পার্টির কেন্দ্রীয় অনেক নেতা, এমনকি শীর্ষে অবস্থানরত লিউ শাউ চীসহ পার্টির বিভিন্ন পর্যায়ের অনেক নেতা, বুদ্ধিজীবী, সরকারি কমকর্তার অবস্থান বিপ্লবের জন্য ক্ষতিকর, বিপজ্জনক বলে অভিহিত হয় এবং তাঁরা তীব্র সমালোচনা ও আক্রমণের শিকার হন। ১৯৬৯ সালে মাও আনুষ্ঠানিকভাবে এর সমাপ্তি ঘোষণা করলেও এর রেশ ১৯৭৬ সালে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

সাংস্কৃতিক বিপ্লবকে কেন্দ্র করে চীনে যখন বিরাট উথাল পাথাল হচ্ছে সেসময় চীন বিপ্লব সম্পর্কে আশংকিত হবার অনেক যুক্তি ছিল। কারণ ততদিনে সোভিয়েত ইউনিয়ন চীনের প্রতি সবরকম সমর্থন সহযোগিতা প্রত্যাহার করেছে, দুদেশের মধ্যে বৈরিতা শুরু হয়েছে। অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থার নেতা হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র নিজের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সামরিক প্রভাববলয় সম্প্রসারণে ব্যস্ত তখন। এর অংশ হিসেবে এশিয়ায় বিভিন্ন প্রান্তে তাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ আগ্রাসন চলছে। ভিয়েতনামে চলছে নৃশংস গণহত্যা, ভিয়েতনামী জনগণ চীনের দীর্ঘস্থায়ী জনযুদ্ধের অনুপ্রেরণায় শক্তিশালী প্রতিরোধ সংগঠিত করছেন। সাম্রাজ্যবাদী প্রচারণা ছাড়াও বাইরের জগতে চীনের ভেতরের ঘটনাবলীর ভিন্ন ভিন্ন কখনো একেবারে বিপরীত প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদ সমর্থক প্রচারমাধ্যমে বহুবছর ধরেই চীন বিপ্লবের সমাপ্তির ঘটার কথা বলা হচ্ছিল। সাংস্কৃতিক বিপ্লব শুরু হবার পর তারা নিশ্চিত হয় যে, চীনের প্রতিবিপ্লবী পরিবর্তন আসন্ন। যুক্তরাষ্ট্রের সমাজতন্ত্রী জার্নাল *মান্থলি রিভিউ* এগুলোর একটা পর্যালোচনাও করেছিল তখন। বহুজাতিক পুঁজির মুখপত্র *ফরচুন* তাদের ১৯৬৬ সালের নভেম্বর সংখ্যায় আনন্দের সঙ্গে জানায় যে, 'গত গ্রীষ্ম থেকে চীনের যে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন মানবজাতির এক চতুর্থাংশের বিশাল দেশকে নাড়া দিচ্ছে তা থেকে স্পষ্ট হয় যে, মাও সেতুং এর কমিউনিস্ট তত্ত্ব ও প্রয়োগ চর্চা নিদারুণভাবে ব্যর্থ হয়েছে। এবং এই চীন এখন এই প্রবল তাড়ায় যেকোনো দিকে চলে যেতে পারে। এটি আরেকটি দীর্ঘমেয়াদী সংঘাতের দিকে দেশটিকে ঠেলে দিতে পারে। ইতিহাসের গতি যে পরিণতি নির্দেশ করে তাতে এই সম্ভাবনাই বেশি যে, কমিউনিস্ট শাসনের পতন ঘটবে এবং তার সঙ্গে মাও সেতুংএরও।'

তবে একইমাসে (নভেম্বর, ১৯৬৬) প্রকাশিত বিখ্যাত জার্নাল *সায়েন্টিফিক আমেরিকান*-এর সংখ্যায় চীনের শিল্পায়ন সহ উন্নয়নের বিশ্লেষণ করে লেখেন একজন জাপানী। সেই লেখা চীনের একটি ভিন্ন চিত্র এবং ভবিষ্যতের একটি ভিন্ন সম্ভাবনা হাজির করে। সেখানে বলা হয়, 'চীনে এখন মাথাপিছু আয় ১০০ ডলার, মোট জাতীয় আয় ৬০ বিলিয়ন ডলার। এইদেশ এখন উত্তরণ (টেকঅফ) স্তর পার হয়ে শিল্পায়ন স্তরে প্রবেশ করেছে। চীন যদি জাপানের অভিজ্ঞতা অনুসরণ করে তাহলে খুব দ্রুত পরিবর্তনের জন্য এইদেশ শিল্প জ্ঞান ও পুঁজি সঞ্চয় করতে সক্ষম হবে এবং উচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পর্বে প্রবেশ করবে। ১০ থেকে ১৫ বছরের মধ্যে এই দেশ জাপানের বর্তমান মাথাপিছু আয়ের স্তরে (৬২০ মার্কিন ডলার) প্রবেশ করবে এবং যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় আয়ের শতকরা ৭০ ভাগের কাছে পৌঁছে যাবে।'

> আন্তর্জাতিক মতাদর্শিক এই বিতর্ককালে চীনে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃবৃন্দের মধ্যেকার বিরোধ কমেনি, বরং ভেতরে ভেতরে আরও দানা বাঁধছিল। উল্লম্ফনের অভিজ্ঞতার পরে মাও সে তুং কিছুটা কোণঠাসা, তাঁর সমালোচক ও বিরোধী অংশই তখন কেন্দ্রীয় কমিটিতে শক্তিশালী। এই পরিপ্রেক্ষিতেই এলো সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ডাক।

১৯৬৬ সালের ২৮ জুলাই রেড গার্ড প্রতিনিধিরা বিপ্লব রক্ষার জন্য আহবান জানিয়ে মাও সেতুংকে একটি চিঠি লেখেন। এর উত্তরে মাও বিশাল পোস্টার আকারে তাঁর বক্তব্য উপস্থিত করেন যার শিরোনাম ছিল, 'বোম্বার্ড দ্য হেডকোয়ার্টার্স', তা ছিল 'প্রতিবিপ্লবের কেন্দ্রে আঘাত' করবার আহবান। মাও লেখেন, 'কমিউনিস্ট বিপ্লবের মধ্য দিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও চীনে বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন এলিট ব্যক্তিরা এখনও সরকার এবং কমিউনিস্ট পার্টির কর্তৃত্বমূলক অবস্থান ধরে আছে।' সবার দৃষ্টি পার্টির কেন্দ্রীয় নেতা লিউ শাও চী এবং দেং জিয়াও পিংএর দিকে গেলেও তাঁরা কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে কখনও বহিষ্কার হননি। তবে পার্টি ও সরকারে তাঁদের প্রভাব কমে যায়, আপেক্ষিক অবস্থান দুর্বল হয়ে পড়ে। আরেকজন নেতা লিন পিয়াও মাও এর খুবই অনুগত হিসেবে তখন সামনের সারিতে জায়গা করে নেন। তবে শীগগিরই তিনি চক্রান্তকারী হিসেবে অভিযুক্ত হন এবং ১৯৭১সালে এক প্লেন দুর্ঘটনায় নিহত হন। সাংস্কৃতিক বিপ্লবকালে সাংগঠনিকভাবে মূল ভূমিকায় ছিল এই 'রেড গার্ড'। সারাদেশ জুড়ে প্রধানত তরুণদের নিয়ে গঠিত এই সংগঠন বিভিন্ন অঞ্চলে সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের লক্ষ্যে বক্তব্য প্রচার করতো, জমায়েত করতো মানুষকে, নাটক গান বিতর্কসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান করতো, গ্রাম শহর কমিউন কারখানায় সন্দেহভাজন প্রতিবিপ্লবী বা গণবিরোধী তৎপরতায় লিপ্ত ব্যক্তিদের গণশুনানীর সম্মুখিন করতো। সমালোচনা হতো, তাদের আত্মসমালোচনার সুযোগ দেয়া হতো। মাও সেতুং এই তরুণদের উদ্দেশ্যেই বলেছিলেন, 'এই বিশ্ব একইসঙ্গে তোমাদের এবং আমাদের। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এটি তোমাদের। তোমরা তরুণেরা, জীবনের প্রাণশক্তিতে পরিপূর্ণ, সকাল ৮টা/৯টার সূর্যের মতো। তোমাদের ওপরই আমাদের ভরসা..এই বিশ্ব তোমাদের। চীনের ভবিষ্যৎ তোমাদেরই হাতে।'

সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ১৬ দফা কর্মসূচি

১৯৬৬ সালের ৮ আগষ্ট সাংস্কৃতিক বিপ্লব সম্পর্কে চীনা কমিউনিস্ট পার্টি আনুষ্ঠানিক অবস্থান ঘোষণা করে যা ১২ আগষ্ট পিকিং রিভিউ-এ প্রকাশিত হয়। এর শিরোনাম ছিল 'মহান সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লব সম্পর্কে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত'। সাধারণভাবে '১৬ দফা' নামে পরিচিত এই সিদ্ধান্তই সাংস্কৃতিক বিপ্লবের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হিসেবে ধরা হয়। এর ১ম দফা 'সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের একটি নতুন পর্যায়', ও ২য় দফায় 'বর্তমান প্রবণতা এবং এর ওঠানামা' শিরোনামে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কারণ, এর লক্ষ্য উদ্দেশ্য, নেতৃত্ব দানকারী বিভিন্ন অংশ, প্রতিবন্ধকতা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা হয়। ৩য় দফায় সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সাফল্যের জন্য পার্টি নেতৃত্বের দৃঢ় ভূমিকার ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়। ৪র্থ ধারায় জোর দিয়ে বলা হয়, 'এই আন্দোলনে জনগণকে নিজেরাই নিজেদেরকে শিক্ষিত করতে হবে। যদি ভুল বা বিশৃঙ্খলা হয় তবুও জনগণের নিজেদের চিন্তাশক্তির ওপর ভরসা করতে হবে।'

৫ম ধারায় পার্টির শ্রেণী লাইন দৃঢ়তার সাথে এগিয়ে নিয়ে যাবার কথা বলা হয়েছে। শিক্ষায়তনে সংস্কারের ওপর গুরুত্ব দিয়ে বলা হয়েছে, 'প্রতিক্রিয়াশীল স্বেচ্ছাচারী বিদ্বান এবং কর্তা ব্যক্তি' আর 'সাধারণভাবে বুর্জোয়া ধ্যান ধারণা সম্পন্ন ব্যক্তিদের' এক করে দেখা চলবে না।' ৬ষ্ঠ ধারায় জনগণের মধ্যে বিভিন্ন দ্বন্দ্বকে যথাযথভাবে সমাধান করবার কথা বলা হয়। এই ধারায় বিভিন্ন মত ও বিতর্ক নিয়ে সতর্ক থাকবার কথা বলা হয় এইভাবে, 'বিতর্কে তথ্য ও যুক্তির ওপরই গুরুত্ব দিতে হবে, তার ভিত্তিতেই অগ্রসর হতে হবে। ভিন্নমত প্রকাশকারী যদি সংখ্যালঘু অংশ হয় তাকে সংখ্যাগুরুর মতের পক্ষে আনার জন্য যে কোনো ধরনের চাপাচাপি বা জোর করা গ্রহণযোগ্য নয়। সংখ্যালঘু অংশকে বরং রক্ষা করতে হবে, কেননা অনেকসময় সত্য আসে সংখ্যালঘু অংশের কাছ থেকেই। যদি তারা ভুলও হয় তবুও তাদের অবস্থানের পক্ষে যুক্তি তর্ক করার সুযোগ দিতে হবে। যখনই কোনো বিষয়ে বিতর্ক হবে তা পরিচালনা করতে হবে যুক্তি দিয়ে, কোনোভাবেই বলপ্রয়োগ বা চাপাচাপি দিয়ে নয়।'

৭ম ধারায় সতর্ক করা হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে, যারা বিপ্লবী জনতাকে প্রতিবিপ্লবী বলে আখ্যায়িত করে। ৮ম ধারায় এই বিপ্লবের ক্যাডারদের বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। ৯ম ধারায় বিভিন্ন অঞ্চলে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পক্ষে গড়ে ওঠা নানা গ্রুপ ও কমিটির ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। এই ধারায় বিষয়টি ব্যাখ্যা করে বলা

হয়েছে, 'মহান সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লবে অনেক নতুন ঘটনা ঘটছে। বহু স্কুল ও অঞ্চলে জনগণ যেভাবে নতুন নতুন সংগঠন গড়ে তুলছেন তা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ এবং ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ...এরা কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে নিজেরাই নিজেদের শিক্ষিত করছে। জনগণের সাথে জনগণের সংযোগ স্থাপনের জন্য এরা এক অসাধারণ সেতু।' এই ধারায় আরও বলা হয় যে, এসব সংগঠন যথাযথভাবে এগিয়ে নেবার জন্য প্যারী কমিউনের মতো সাধারণ নির্বাচন চালু করতে হবে।

শিক্ষা সংস্কারের কথা বলা হয় ১০ম ধারায়। এখানে শিক্ষার পাঠ্যসূচি নিয়ে আলোচনা ছাড়াও বলা হয়, স্কুলের সময় কমাতে হবে, কোর্স আরও কমাতে এবং উন্নত করতে হবে। শিক্ষা উপকরণগুলোর মধ্যে মৌলিক পরিবর্তন আনতে হবে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আরও সহজ করতে হবে। ১১শ ধারায় প্রকাশ্যে বা সংবাদপত্রে নাম ধরে কারও সমালোচনা প্রসঙ্গে সতর্ক করে দিয়ে বলা হয়, সংশ্লিষ্ট পার্টি কমিটির আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত ছাড়া ব্যক্তিগতভাবে কারও নাম ধরে সমালোচনা প্রচার ঠিক হবে না। পত্রিকায় কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি ধরে নয় বরং প্রবণতা ধরে সাধারণ সমালোচনা রাখতে হবে। ১২শ ধারায় 'বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ ও কর্মীদের' সম্পর্কে বলা হয়, তারা যদি পার্টি এবং সমাজতন্ত্রের বিরোধী না হয়, যদি দেশপ্রেমিক হিসেবে কাজ করে তাহলে তাদের কাজে ও বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গীর যথাযথ পরিবর্তনে সকল সহযোগিতা দেয়া হবে। একবছর আগে শুরু হয়েছিল 'সমাজতান্ত্রিক শিক্ষা আন্দোলন'। এর সাথে শহর ও গ্রামে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কর্মসূচি সমন্বয়ের বিষয়ে বলা হয় ১৩শ ধারায়। ১৪শ ধারায় বিপ্লবকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে উৎপাদন বৃদ্ধির ওপর জোর দেয়া হয়। বলা হয়, 'সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে, উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে না।' সাংস্কৃতিক বিপ্লবে গণমুক্তি বাহিনীসহ সামরিক বাহিনীর ভূমিকা বিষয়ে বিস্তারিত বলা হয় ১৫শ ধারায়। ১৬শ ধারায় বলা হয়, 'এই মহান সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লবে আমাদের সকল কাজের দিশা নিতে হবে 'মাও সে তুং চিন্তাধারা' থেকে।'

তাঁদের মূল্যায়নে এই ১৬ দফা ঘোষণা ছিল 'যৌক্তিক, বিপ্লবী এবং মানবিক' দলিল। মাও সে তুং এর নেতৃত্ব, তাঁর প্রতি চীনের মানুষের বিপুল আস্থার বিষয়টি তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ বলেছিলেন, তবে এই ভালোবাসা ও আস্থা ব্যক্তিপূজায় পরিণত হবার বিষয়ে তাঁরা সতর্কও করেছিলেন।

১৬ দফা ঘোষণার শুরুতেই বলা হয়েছিল, চীন বিপ্লবের মধ্য দিয়ে 'যদিও বুর্জোয়াদের উচ্ছেদ করা হয়েছে তবুও তারা শোষক শ্রেণীর পুরনো ধ্যানধারণা,সংস্কৃতি, প্রথা ও অভ্যাস দিয়ে মানুষকে দূষণ করে আবারো ফিরে আসার চেষ্টা করছে।' এদের মধ্যে ক্ষমতাবানও অনেকে আছে যাদের পরাজিত করে বিপ্লবকে রক্ষা ও তাকে এগিয়ে নেওয়ার কর্মসূচি হিসেবেই এই সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ঘোষণা।

যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রকাশিত সমাজতন্ত্রী পত্রিকা মান্থলি রিভিউ-র সম্পাদক পল সুইজী এবং হ্যারী ম্যাগডফ চীন বিপ্লবকে প্রথম থেকেই ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করছিলেন, বিভিন্ন পর্যায়ে যোগাযোগ রাখছিলেন। তাঁরা ১৯৬৭ সালের জানুয়ারিতে নিজেদের পত্রিকায় এই ঘোষণার সারসংক্ষেপ ও মূল্যায়ন প্রকাশ করেছিলেন।[৮] তাঁদের মূল্যায়নে এই ১৬ দফা ঘোষণা ছিল 'যৌক্তিক, বিপ্লবী এবং মানবিক' দলিল। মাও সে তুং এর নেতৃত্ব, তাঁর প্রতি চীনের মানুষের বিপুল আস্থার বিষয়টি তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ বলেছিলেন, তবে এই ভালোবাসা ও আস্থা ব্যক্তিপূজায় পরিণত হবার বিষয়ে তাঁরা সতর্কও করেছিলেন।

সাংস্কৃতিক বিপ্লব : একজন বাংলাদেশির অভিজ্ঞতা

শুরু থেকেই চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ করেছেন বাংলাদেশের বিশিষ্ট সাংবাদিক ও লেখক ফয়েজ আহমেদ। তাঁর কাছ থেকে চীনের ইতিহাসের দুই পর্বের অভিজ্ঞতা পাওয়া যায়। একটি ১৯৬৬ সাল যখন সেখানে সাংস্কৃতিক বিপ্লব চলছিল এবং আবার ১৯৮৩ সাল যখন চীন সম্পূর্ণ ভিন্ন অভিমুখে সংস্কার করে অগ্রসর হচ্ছে। ১৯৬৬ সালে তিনি পিকিংএ অবস্থান করছিলেন তৎকালীন দৈনিক আজাদ-এর প্রতিনিধি হিসেবে।[৯] এই সময় ভিয়েতনামে মার্কিনী আগ্রাসন চলছিল। এই সময় অনেকবারই মার্কিনী বিমান ও রণতরী চীনের আকাশ ও সমুদ্রসীমা লংঘন করে। এসব তৎপরতার বিরুদ্ধে তখন পর্যন্ত চীনকে ৪ শতাধিক সতর্কতামূলক প্রতিবাদ জানাতে হয়।

সাংস্কৃতিক বিপ্লবকে বলা হচ্ছিল 'শুদ্ধি অভিযানের আন্দোলন' যা পরিচালিত হচ্ছিল চার পুরাতনের বিরুদ্ধে– 'প্রাচীন চিন্তাধারা', 'প্রাচীন অভ্যাস', 'প্রাচীন দেশাচার' ও 'প্রাচীন সংস্কৃতি'। বিরাট আকৃতির 'তাজেবাও' বা পোস্টারে লেখা হয়েছে– 'আমরা প্রাচীন পৃথিবীর সমালোচক, আমরা নতুন পৃথিবীর স্রষ্টা।' রাস্তার নাম, ভবনের নাম পরিবর্তন হতে থাকে। ফয়েজ আহমেদ লিখছেন, 'পিকিং এর সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ও জনবহুল সম্ভ্রান্ত বিপণি কেন্দ্রের রাস্তার নাম ছিল ওয়াং ফু চিং বা 'রাজকুমারের কুয়োপথ'। লাল প্রহরীরা এই নাম পরিবর্তন করে 'জনপথ' করেছেন। শহরে প্রধান রাস্তা, যা পিকিংকে দুভাগ করে তিয়ান আন মেন স্কোয়ারের উপর দিয়ে গেছে, তার নাম ছিল 'চ্যাংআন' (চিরশান্তি)। নতুন নাম হয়েছে এর 'তুং ফাং হোং'– পূর্ব দিগন্তে লাল সুর্যোদয় (ইস্ট ইজ রেড)।' এরকম সোভিয়েত দূতাবাসের সামনের সড়ক 'সংশোধনবাদ বিরোধী পথ', ভিয়েতনাম দূতাবাসের সামনের সড়ক 'ভিয়েতনামকে সাহায্য কর স্ট্রীট' ইত্যাদি। একসময় মার্কিনীদের নিয়ন্ত্রণে থাকা হাসপাতালের নাম দেয়া হয়েছে, 'সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী হাসপাতাল'।

পোশাক, খাবার, ফ্যাশন ইত্যাদি নিয়েও কথা ও বিতর্ক হচ্ছিল। বলা হয়েছে, 'দেশের অধিকাংশ মানুষই যখন কাপড়, ক্যানভাস, তুলোর ও প্লাস্টিকের জুতো পরে, তখন মুষ্টিমেয় ব্যক্তির চামড়ার দামি জুতো পরার চেষ্টা বাঞ্ছনীয় নয় (এদেশে এখন কাউকে খালি পায়ে দেখা যায় না)।' ছেলে ও মেয়েদের চুলের ফ্যাশন নিয়ে আপত্তি দেখা দেয়ায় কিছুদিনের জন্য মেয়েদের লম্বা বেণী বন্ধই হয়ে গিয়েছিল। ফয়েজ আহমেদ লিখেছেন, দুমাসের মাথায় 'নভেম্বরে পিকিং শহরে অনেক মেয়ের মাথায় লম্বা বেণী দেখা গেছে। তাছাড়া পরবর্তীকালে সিংকিয়াং থেকে রাজধানীতে আগত মেয়ে লাল প্রহরীদের অধিকাংশেরই দীর্ঘ কেশ ছিল। সম্ভবত কর্তৃপক্ষ দীর্ঘ কেশের বিরুদ্ধে অভিযানকে লাল প্রহরীদের "অতিরিক্ত তৎপরতার" মধ্যে গণ্য করেছেন।'

চীনের গ্রাম ও শহর সর্বত্র তখন তরুণ রেড গার্ড বা লাল প্রহরীদের তৎপরতা। সব অঞ্চলের চেহারাই পাল্টে গেছে তখন তাদের সক্রিয়তায়। ফয়েজ দেখছেন, 'এখন পিকিং শহরের সর্বত্র চেয়ারম্যান মাও সে তুং এর চিত্র আর তাঁর পুস্তক থেকে উদ্ধৃতি দেখা যাচ্ছে। সমগ্র শহরটা তাঁর চিত্র ও বাণীতে ছেয়ে গেছে। এমন একটি প্রকাশ্য বা

অপ্রকাশ্য স্থান নেই, যেখানে চেয়ারম্যান মাও-এর ছবি ও উদ্ধৃতি টাঙ্গানো হয়নি। লাল প্রহরী আন্দোলনের প্রবাহে এই চিত্র ও বাণী টাঙ্গানোর জোয়ার এসেছে। তবে এই আন্দোলনের পূর্বেও তাঁর চিত্র ও বাণী দেখা যেত – এমন ব্যাপক ছিল না। কেউ কেউ অনুমান করেন যে, এ শহরে প্রায় এক মিলিয়ন সাইকেল রয়েছে – এখন প্রত্যেক সাইকেলচালক তার সাইকেলের হাতলের মধ্যভাগে চেয়ারম্যান মাও-এর বাণী লিখিত এক টুকরো বোর্ড টাঙ্গিয়েছেন। বাস ও ট্রলিবাসে তাঁর ছবি ও বাণী রয়েছে। আর এ সমস্ত যানের সামনে বিপ্লবের চিহ্ন লাল পতাকা উড়ছে।'

বিশ্ববিদ্যালয়, কারখানা, কমিউন, শহর সর্বত্রই মাঝেমধ্যেই উত্তেজনা তৈরি হচ্ছে। শত্রু চিহ্নিত করতে গিয়ে ভুলও হচ্ছে অনেকরকম। সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি আহমেদ লেখেন, 'গত সপ্তাহে শহরের জনবহুল এলাকার দেয়ালে পলাতক প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তিদের ফটোসহ পোস্টার দেখা গেছে। লাল প্রহরীগণ এদের সন্ধান করে বেড়াচ্ছেন। এদের বিরুদ্ধে মারাত্মক অভিযোগ রয়েছে। পলাতকদের ধরার জন্য লাল প্রহরীদল অনেক সময় শহর থেকে নির্গমনের পথে গাড়ি তল্লাসি করছেন।... কয়েকদিন যাবৎ দেশরক্ষা মন্ত্রী লিন পিয়াও-এর রচনা ও বক্তৃতা থেকে উদ্ধৃতিযুক্ত পোস্টার দেখা যাচ্ছে। তাঁর 'জনযুদ্ধ জিন্দাবাদ' পুস্তিকার বিশেষ ও ব্যাপক প্রচার করা হচ্ছে।'

আগেই বলেছি, সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় লিন পিয়াও-এর গুরুত্ব দ্রুত বাড়তে থাকে। তিনি গুরুত্বের দিক থেকে মাও এর পরই গণ্য হতে থাকেন। মনে হচ্ছিল তিনিই মাও এর সবচাইতে বেশি আস্থাভাজন। ১৯৬৬ সালে লক্ষ লক্ষ মানুষের বিভিন্ন সমাবেশে নেতৃবৃন্দের উপস্থিতি, বক্তৃতা এবং অবস্থান থেকে এই বিষয়টিই স্পষ্ট হচ্ছিল। একই বছরের ১ অক্টোবর চীনের জাতীয় দিবসে যথারীতি তিয়ান আন মেন স্কোয়ারে ১৫ লক্ষ মানুষের বিশাল সমাবেশ হয়। সমাবেশে 'দেশরক্ষা মন্ত্রী লিন পিয়াও পার্টি ও সরকারের পক্ষ থেকে র‍্যালিতে বক্তৃতা করেন। প্রেসিডেন্ট লিউ শাও চী, প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই ও মার্শাল চু তে মঞ্চের ওপর চেয়ারম্যান মাও এর সাথে থাকলেও বক্তৃতা করেননি। রেডিওতে প্রেসিডেন্ট লিউ শাও চীর নাম এবার লিন ও চৌ-এর পরই প্রচার করা হয়েছে। গত কিছুদিন তাঁর নাম সপ্তম নম্বরে দেখা গিয়েছিল।' এই লিন পিয়াও এর বিরুদ্ধেই এর কয়েক বছরের মাথায় বিপ্লববিরোধী সামরিক অভ্যুত্থানের চক্রান্তের অভিযোগ ওঠে।

সাংস্কৃতিক বিপ্লব: ডান ও বাম বিচ্যুতির কথা

রুশ ও চীন বিপ্লব এবং এসব দেশে বিপ্লব-উত্তর গতি-বিতর্ক-সংকট সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা ও গবেষণার জন্য ফরাসি মার্কসবাদী পন্ডিত চার্লস বেটেলহেইম (১৯১৩- ২০০৬) বিখ্যাত। রাশিয়া ও সোভিয়েত ইউনিয়নে বিপ্লব উত্তর বিতর্ক, ওঠানামা, শ্রেণী দ্বন্দ্ব ও শ্রেণী সংগ্রাম নিয়ে কয়েক খন্ডে তাঁর গ্রন্থ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। চীনের ব্যাপারেও বিপ্লব ও বিপ্লব উত্তর পর্যবেক্ষণ, পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ আছে তাঁর। ১৯৬৬ সালে সাংস্কৃতিক বিপ্লবকালে এবং এরপর বেশ কয়েকবার তিনি চীন সফর করেন। তিনি ছিলেন ফ্রান্স-চীন মৈত্রী সমিতির সভাপতি।

সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় বেটেলহেইম বেশকিছু শিল্প এলাকা পরিদর্শন করেন এবং শ্রমিকদের ভূমিকার প্রতি বিশেষ নজর দেন। তিনি বলেন, প্রশ্ন থাকলেও শ্রমিকদের 'বেশ কয়েকমাস লাগলো বিদ্যমান ব্যবস্থা নিয়ে সরব হতে।' সকল শিল্পকারখানাতেই শ্রমিকদের 'ব্যবস্থাপনা কমিটি' ছিল যাতে ছিলেন শ্রমিকদের নির্বাচিত প্রতিনিধি আর যাদের ঐ পদ থেকে প্রত্যাহার করবারও সুযোগ ছিল। এঁদের দায়িত্ব ছিল প্রধানত পাঁচ ক্ষেত্রে: (১) মতাদর্শিক ও রাজনৈতিক; (২) উৎপাদন ও কারিগরি বিষয়; (৩) ব্যয় নিয়ন্ত্রণ ও বিনিয়োগসহ অর্থসংস্থানের বিভিন্ন দিক; (৪) কাজের নিরাপত্তা; ও (৫) সাধারণ কল্যাণ। এই কমিটি ছিল বস্তুত ফ্যাক্টরি ব্যবস্থাপনা ও সাধারণ শ্রমিকদের যোগসূত্র। এই কমিটি কারখানার পার্টি কমিটির নেতৃত্বেই কাজ করতো।

সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময়ে পার্টি কমিটি যখন বহুস্থানে অকার্যকর হয়ে যায় তখন 'সংশোধনবাদী ব্যবস্থাপনার' বিরুদ্ধে অনেকগুলো কারখানায় বিপ্লবী কমিটি গড়ে ওঠে। এই কমিটিগুলোতে তিন অংশের প্রতিনিধিত্ব ছিল – জনতা, পার্টিকর্মী ও পিপলস লিবারেশন আর্মির সৈন্য। তিন বয়স গ্রুপের মানুষ রাখা হতো কমিটিতে: তরুণ, মধ্যবয়সী ও প্রবীণ। পুরনো পার্টি কমিটিগুলো থেকে কিছু বহিষ্কারের ঘটনাও ঘটে তখন। তবে বেটেলহেইম ১ হাজার ১১৯টি কারখানায় জরীপ চালিয়ে দেখেছেন শতকরা মাত্র ১.২ ভাগ কারখানায় পার্টি কমিটিগুলোর পুরনো সদস্য বহিষ্কারের ঘটনা ঘটেছে।

বেটেলহেইম লিউ শাউ চী-র বক্তব্য সম্পর্কে বলেছেন, লিউ মুনাফা, বস্তুগত প্রণোদনা ও বিশেষজ্ঞদের ওপর নির্ভরশীলতার ভিত্তিতে সকল উৎপাদনশীল প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ওপর জোর দিয়েছেন। এই দৃষ্টিভঙ্গীর বিরুদ্ধে মাও সে তুং এর লাইনকেই সঠিক বলেছেন তিনি। এর কারণটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, যদি মুনাফা প্রণোদনাই সকল উৎপাদন তৎপরতার পরিচালনা শক্তি হয়, তাহলে উৎপাদন সম্পর্কের বিপ্লবীকরণের বদলে শ্রমিকেরা নিজেদের ব্যক্তি স্বার্থ এবং মুনাফাবৃদ্ধির উপযোগী উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে মনোযোগী হয়। ব্যক্তিগত প্রণোদনা ব্যবস্থা কার্যকর করতে গেলে পুরো ব্যবস্থার মধ্যে তত্ত্বাবধান, নিয়ন্ত্রণ ও হায়ারার্কির মাধ্যমে পুঁজিবাদী সম্পর্কেরই পুনরুৎপাদন ঘটায়। যদি এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম সজীব না থাকে তাহলে পুঁজিবাদের পুনরুত্থান একটি সার্বক্ষণিক সম্ভাবনা হিসেবেই থেকে যায়।

এর পাশাপাশি 'ডান বিচ্যুতি'র বিরোধিতা করতে গিয়ে সাংস্কৃতিক বিপ্লবকালে যে 'বাম বিচ্যুতি'র ঘটনাও ঘটছিল সেবিষয়েও বেটেলহেইম বিশেষ মনোযোগ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন দুটো ঝোঁক চীনের বিপ্লবীদের মধ্যে সমস্যাজনক হয়ে ওঠেছিল। একদিকে, মত ছিল যে, 'উৎপাদিকা শক্তি' যথেষ্ট বিকশিত না হওয়া পর্যন্ত সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে কোন নতুন পরিবর্তনের চাপ তৈরি করা যাবে না। এই সময়ে অর্থনৈতিক দক্ষতাবৃদ্ধিকে প্রধান গুরুত্ব দিয়ে বিশেষ ধরনের শৃঙ্খলা ও বিধিবিধান তৈরি করতে হবে। এটাই লিউ ও তাঁর সহযোগীদের লাইন ছিল। অন্যদিকে এর বিপরীতে বাম গোঁড়ামি বা উগ্রপন্থা দেখা যায়। যারা ঐ মুহূর্তেই ব্যক্তি মালিকানার সব চিহ্ন মুছে ফেলার জন্য চাপ দিচ্ছিলেন। কমিউনগুলোতে কাজ অনুযায়ী মজুরি প্রদানকেও তারা বাধা দিচ্ছিলেন। তাদের লাইন ছিল সকল ব্যক্তিগত জমি ও তাতে চাষাবাদ তখনই বন্ধ করে দিতে হবে। কোনো প্রস্তুতির বিষয় তাদের বিবেচনায় গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। মতাদর্শিক ও রাজনৈতিক সংগ্রাম পরিচালনা না করে ব্যক্তিগত আক্রমণ, সামাজিকভাবে অপদস্ত করা এমনকি শারীরিক আক্রমণের ঘটনা তারা ঘটাতে থাকেন। যেমন, সাংহাইতে আয়রন এ্যান্ড স্টীল ইনস্টিটিউট মাসের পর মাস অচল থাকে এই ধরনের তৎপরতার জন্য। কয়েক মাস পর উগ্র বামপন্থী নেতাকে পার্টি থেকে বহিষ্কারের পরই আবার তা চালু হয়। ঐ নেতা ওখানকার শ্রমিক ছিলেন না, ছিলেন বুদ্ধিজীবী।[১০]

রাজনৈতিক সংগ্রামে অর্থনৈতিক অগ্রগতি

প্রকৃতপক্ষে সাংস্কৃতিক বিপ্লবে কৃষক শ্রমিকদের অংশগ্রহণ যতো বাড়তে থাকে ততোই এর নানামুখি বিচ্যুতি কমতে থাকে। কেননা কৃষক শ্রমিকদের বিভিন্ন ইউনিট বা সাংগঠনিক কাঠামো নির্বিচার বাড়াবাড়ির পরিবর্তে সুনির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে কাজ করতে বেশি আগ্রহী ছিল। তাঁদের প্রয়োজন ছিল উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি নিজেদের বিপ্লবী সম্পর্কের বিষয়ে যথাযথ দৃষ্টি দেয়া। অনাবশ্যক বা ইচ্ছামতো কাউকে আঘাত করা বা তোয়াজমুখি তৎপরতার সময় বা সেরকম মনোভঙ্গী তাদের মধ্যে কমই দেখা গেছে।

উচ্চলক্ষ এবং সাংস্কতিক বিপ্লবে যে উথাল পাথাল হয়, কেন্দ্র থেকে প্রান্ত পর্যন্ত রাজনৈতিক ক্ষমতা বিন্যাসে যেরকম পরিবর্তন বা টানাপোড়েন দেখা যায় তাতে অর্থনৈতিক সূচকগুলোতে অবনতি দেখা দেবার কথা। কিন্তু তা ঘটেনি বরং অনেকক্ষেত্রে তা যে সহায়ক হয়েছে তার প্রমাণ পাওয়া যায় বিভিন্ন তথ্য থেকে। ভারতের অনীক পত্রিকার সম্পাদক, লেখক ও গবেষক দীপংকর চক্রবর্তী বিভিন্ন তথ্যপ্রমাণ ঘেঁটে একই সময়ে ভারত ও চীনের অর্থনৈতিক অগ্রগতির তুলনামূলক আলোচনা করেছিলেন। তিনি পিকিং রিভিউ, জার্নাল অব কনটেমপোরারী এশিয়ায় প্রকাশিত রিপোর্ট এবং তার সাথে নিকোলাস ব্রুনার, এডগার স্নো, ফেলিক্স গ্রীনের গ্রন্থ পর্যালোচনা করে এই তুলনামূলক চিত্রটি হাজির করেছিলেন। সময়কাল ধরা হয়েছিল ১৯৫০-৫১ থেকে ১৯৭০-৭১। দেখিয়েছেন, এই বিশ বছরে ভারতে জাতীয় আয় বেড়েছে শতকরা ৪১ ভাগ, চীনে ৬ গুণ; শিল্প উৎপাদন ভারতে বেড়েছে ২ গুণ, চীনে ২০ গুণ; কৃষি উৎপাদনে বেড়েছে ভারতে শতকরা ৮২ ভাগ, চীনে ২.৫ গুণ; রেলপথ ভারতে বেড়েছে শতকরা ২০ ভাগ, চীনে ৪ গুণ; বিদ্যুৎ শক্তি ভারতে বেড়েছে ৯ গুণ, চীনে ৩০ গুণ।[১১]

চীনের সমাজতন্ত্রে উত্তরণ সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খুবই মনোযোগী বিশ্লেষকদের লেখা নিয়ে প্রকাশিত আরেকটি গ্রন্থে আরও সতর্কতার সাথে অর্থনৈতিক অগ্রগতির হিসাব ও পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থের সম্পাদকমন্ডলী প্রথমেই বলেছেন, 'সমাজতন্ত্রে উত্তরণের প্রাথমিক স্তরে (চীনের কমিউনিস্ট) পার্টি দুটো কাজকে গুরুত্ব দিয়েছে বেশি। এগুলো হল: (ক) দারিদ্র ও অর্থনৈতিক স্থবিরতা থেকে মুক্তির জন্য শিল্পায়নকে ভিত্তি করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন; এবং (খ) দীর্ঘমেয়াদে উৎপাদন উপায়ের ওপর ব্যক্তি মালিকানা থেকে যৌথ ও রাষ্ট্রীয় দুভাবেই সমাজতান্ত্রিক মালিকানায় উত্তরণ।'[১২]

এই গ্রন্থে প্রদত্ত হিসাব অনুসারে ১৯৫২ থেকে ১৯৭৬ পর্যন্ত শিল্প উৎপাদন বেড়েছে গড়ে শতকরা ১১ ভাগ হারে। সেই তুলনায় খাদ্যশস্য উৎপাদন বেড়েছে কম হারে যদিও তা জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের তুলনায় বেশি ছিল। কৃষিখাতে সেই সময় শুধু মালিকানায় পরিবর্তন আসেনি, কৃষি যন্ত্রপাতি এবং অবকাঠামোগত পরিবর্তনও হয়েছে বিস্তর। কৃষির সাথে সম্পর্কিত ছিল বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ ব্যবস্থাপনা। বলা হয়, চীনের কৃষিতে ভূমি উন্নয়ন, সেচ, পানি সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদির মধ্য এই সময়কালে নতুন প্রায় ১০ কোটি বাড়তি কর্মসংস্থান হয়। ১৯৫০ দশকে দামস্তর মোটামুটি স্থিতিশীল ছিল। ৬০ দশকের প্রথমদিকে এই দামস্তরের কিছুটা বৃদ্ধি ঘটে, তবে ৭০ দশকের মাঝামাঝি তা আবার স্থিতিশীল হয়। গ্রন্থকারদের মতে, এই সময়কালে কৃষি ও শিল্প উৎপাদনে যে মাত্রায় অগ্রগতি হয়েছে শ্রমজীবী মানুষের জীবনযাত্রার মানের উন্নতি সেই তুলনায় কম হয়েছে।

গ্রন্থভুক্ত একটি প্রবন্ধে ভিক্টর লিপ্পিট দেখিয়েছেন, সমাজতন্ত্রে উত্তরণে অগ্রগতি নির্ভর করে কতটা সাফল্যের সঙ্গে সমাজের পুরনো দ্বন্দ্ব নিরসন করা যায় তার ওপর। এগুলোর মধ্যে আছে প্রত্যক্ষ উৎপাদকদের সঙ্গে সমাজের দ্বন্দ্ব, সামাজিক চেতনা বিকাশের সঙ্গে সমাজের বিদ্যমান বিন্যাসের দ্বন্দ্ব, জনগণের সাথে নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব। তিনি এইসাথে আশংকা প্রকাশ করেছিলেন যে, এসব দ্বন্দ্ব যথাযথভাবে নিরসন না হলে পার্টি ক্যাডার ও আমলাদের মধ্য থেকে একটি নতুন ক্ষমতাবান শ্রেণীর উদ্ভব ঘটা খুবই সম্ভব। যার ফলে '(১) এরা অর্থনৈতিক উদ্বৃত্তের একটি বড় অংশ আত্মসাৎ করবে, প্রত্যক্ষ উৎপাদকদের সাথে তাদের স্বার্থের দ্বন্দ্ব বাড়বে। (২) নিজেদের জীবন ও তৎপরতার ওপর শ্রমজীবী মানুষের নিয়ন্ত্রণ কমবে। এবং (৩) প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোতেও নতুন শ্রেণী ক্ষমতা তৈরি হবে।' এই আশংকা যে খুবই সঠিক ছিল তা পরে প্রমাণিত হয়েছে।

সাংস্কৃতিক বিপ্লব চলাকালীন সময়ই মাও সেতুং বলেন, 'বর্তমান মহান সাংস্কৃতিক বিপ্লব এই ধরনে এটাই প্রথম। ভবিষ্যতে এরকম আরও বহু সাংস্কৃতিক বিপ্লবের প্রয়োজন হবে। কে বিজয় লাভ করবে, সমাজতন্ত্র না পুঁজিবাদ, তার নিষ্পত্তির জন্য দীর্ঘ ঐতিহাসিক পর্বের প্রয়োজন হবে। এই সংগ্রাম যদি সফলভাবে পরিচালনা করা না যায়, তাহলে পুঁজিবাদের পুনরুত্থান সবসময়ই একটি সম্ভাবনা হিসেবে জাগরুক থাকবে।' বলাই বাহুল্য, সাংস্কৃতিক বিপ্লবের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তির পর ৭০ দশকেই আমরা চীনে ভিন্নমুখি যাত্রার সূচনা দেখতে থাকলাম। (চলবে)

আনু মুহাম্মদ: লেখক, শিক্ষক। অর্থনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।
ইমেইল: anu@juniv.edu

তথ্যসূত্র:

১। Utsa Patnaik: 'Revisiting Alleged 30 Million Famine Deaths during China's Great Leap'
http://mrzine.monthlyreview.org/2011/patnaik260611.html

২। Joseph Ball: "Did Mao Really Kill Millions in the Great Leap Forward?" September 21, 2006
http://monthlyreview.org/commentary/did-mao-really-kill-millions-in-the-great-leap-forward/

৩। Dongping Han: *Farmers, Mao, and Discontent in China: From the Great Leap Forward to the Present,* 2011

৪। Martin Nicolus: *Restoration of Capitalism in the USSR,* 1975

৫। *আন্তর্জাতিক মতাদর্শগত মহাবিতর্ক* ১ম খণ্ড (সোভিয়েত ও চীনের কমিউনিস্ট পার্টির মতাদর্শগত মহাবিতর্কের দলিল সংকলন), পিপলস বুক সোসাইটি, কলকাতা।

৬। *আন্তর্জাতিক মতাদর্শগত মহাবিতর্ক* ১ম খণ্ড (সোভিয়েত ও চীনের কমিউনিস্ট পার্টির মতাদর্শগত মহাবিতর্কের দলিল সংকলন), পিপলস বুক সোসাইটি, কলকাতা।

৭। পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৪-৫৫

৮। The Editors: "The Cultural Revolution in China", *Monthly Review*, NY, January 1967

৯। ১৯৬৬ সালে ফয়েজ আহমেদ-এর পাঠানো প্রতিবেদনগুলো পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়: *পিকিং থেকে লিখছি*, চয়নিকা প্রকাশনী, ঢাকা। মার্চ, ১৯৬৭

১০। Charles Bettelheheim: *Cultural Revolution and Industrial Organization in China*. MR, NY, 1974

১১। *দীপংকর চক্রবর্তীর নির্বাচিত রচনা*, 'ভারত ও চীন- দুই দেশ দুই অর্থনীতি দুই পথ' (প্রথম প্রকাশ অনীক, ফেব্রুয়ারি ১৯৮২), প্রথম খণ্ড, পিপলস বুক সোসাইটি, কলকাতা, ২০১৪। পৃ. ১৫৮

১২। Mark Selden and Victor Lippit (ed): *The Transition to Socialism in China*, NY, 1982